

গৌড়ীয় নৃত্যে আবহ সংগীতের পর্যালোচনা

সোমাস্রী কোলে^১ এবং মহুয়া মুখোপাধ্যায়^২

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বাস এই বাংলায়। বঙ্গে বৈদিক যুগের আগে থেকে দ্রাবিড় ও আর্য জাতির সংমিশ্রণে মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধ, জৈন, তান্ত্রিক, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের নৃত্য, গীত, তন্ত্রীবাদ্য, সরস্বতী বীণা, সহস্র বীণার পরিচয় পাই। শিলভদ্র, শান্তিরক্ষীত, চন্দ্রগোমিন, বাংলার পাল রাজত্বের সময় আচার্য ছিলেন নালন্দার। বল্লাল সেন, জীমূতবাহন, গৌড়পাদ, চক্রপানি দত্ত, ধোয়ী, হলায়ুধ, গোবর্ধনআচার্য, সন্ধ্যাকরনন্দী প্রমুখ বাঙালি সিদ্ধাচার্যদের গ্রন্থ মধ্যযুগের অমূল্য সম্পদ, যাতে নৃত্যগীত বাদ্যের অজস্র প্রমাণ পাই; যা ‘গৌড়ীয় সংগীত’ নামে প্রচলিত ছিল। গৌড়ীয় সংগীতে বাংলার প্রাচীন ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী সহ নৃত্য ও বাদ্যের পরিচয় পাই। বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনগুলি এইসব প্রাচীন রাগে গাওয়া হয়। দণ্ডিনের কাব্যে ভাষার দিক থেকে গৌড়ী রীতি ও গৌড় মার্গ নামের উল্লেখ আছে। তাই সেই গৌড়ীয় সংগীত যে শাস্ত্রীয় ছিল তা কোন কোন শাস্ত্র গ্রন্থে কত খুঁটান্দে রচিত হয়েছিল তার উল্লেখ করেছি। যেকোন নৃত্য গীত বাদ্য ধারা শাস্ত্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। তাই শাস্ত্র, ভাস্কর্য, চিত্রকলা হল নৃত্য গীতের জীবন্ত দলিল।

শব্দসূচী: গৌড়ীয় নৃত্য, গৌড়ের সংগীত, প্রবন্ধ গীতি, চর্যাগীত, মনসামঙ্গল, শৈবনৃত্য, রঙ্গমঞ্চ।

ভূমিকা: বাংলার ধ্রুপদী তথা শাস্ত্রীয় নৃত্য নেই এই ভুল ধারণার বিপরীতে গিয়ে প্রফেসর মহুয়া মুখোপাধ্যায় বাংলার নৃত্যকে পুনঃআবিষ্কার করে দেশ পত্রিকায় ১৯৯৯ সালের ৬ই মার্চ গৌড়ীয়ের জন্মসূত্র জনসমক্ষে প্রমাণ করলেন। তখন বিভিন্ন মহলে বিতর্কের ঝড় শুরু হয়েছিল। কিন্তু ‘গৌড়ীয় নৃত্য ভারতীর’ প্রতিষ্ঠাতা ও গৌড়ীয় নৃত্যের পুনঃআবিষ্কর্তা ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায় ও সংগীত গবেষক পণ্ডিত অমিতাভ মুখোপাধ্যায় সারা বাংলা তথা ভারত ঘুরে ঘুরে বাংলার প্রাচীন মূর্তি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য খুঁজে খুঁজে প্রকৃত তথ্য প্রমাণসহ যখন দিনের পর দিন প্রকাশ করতে শুরু করলেন তখন গৌড়ীয়ের প্রভাব বিশ্বব্যাপী প্রচার হতে শুরু করল। আর প্রতিপক্ষরাও বুঝতে পারল যে শাস্ত্রগ্রন্থ, সাহিত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা গভীর অধ্যয়ন না করলে প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত গুরু, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হওয়া যায় না ও শাস্ত্রকে টিকিয়ে রাখা যায় না। শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রসঙ্গ আসলেই ভরতনাট্যম, কথক, কুচিপুড়ি, মণিপুরি, ওড়িশির কথাই সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন কিন্তু সেই মণিপুরি বা ওড়িশি বা কুচিপুড়ির শাস্ত্রীয় অধিকার কিন্তু মাত্র অল্প কিছু বছর আগে স্বীকৃত হয়েছে। এগুলি সবই মন্দির কেন্দ্রিক নৃত্যধারা। আর প্রাচীনকাল থেকে মন্দিরে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, সাহিত্যে বাংলার মন্দির কেন্দ্রিক যে ধর্মীয় নৃত্যগীত ধারা চলে আসছে তার প্রাণবায়ুর প্রমাণ অনবরত দিয়ে চলেছে। তার স্বরূপ যে শাস্ত্রীয় ছিল এটা স্বীকার করতে অনেকেই দ্বিধাবোধ করেন, যা বড়ই বিচিত্র। বাংলা যে একসময় বঙ্গ, গৌড়, বঙ্গাল প্রভৃতি নামে প্রচলিত ছিল এবং তার রীতি, গীতি, বাদ্য, নৃত্য, সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য, রাগরাগিণী প্রভৃতি যে গৌড়ী বা গৌড়ীয় নামে পরিচিত ছিল, গৌড়ীয় নৃত্যের সাথে গৌড়ীয় সংগীত যে শাস্ত্রীয়, নিম্নে আমি তার প্রমাণ তুলে ধরব। কারণ যে কোন নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রাচীনের ওপর আশ্রয় করে বিস্তার লাভ করে। তাই প্রাচীনের ঐতিহ্যকে আমরা কখনোই অস্বীকার করতে পারিনা। শুধু দরকার সেই ইতিহাসের, শাস্ত্রের, পুঁথির পাতা উল্টে তার গভীরতা অন্বেষণ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাইকেল মধুসূদনের কথায় বাঙালি পরধন লোভে মত্ত। যাইহোক, সাহিত্যিক মানুষরা চিরকাল সাহিত্য শিল্প রচনা করে গেছেন এবং তার কদরও করেছে কিছু সাহিত্যপ্রেমী মানুষ। বহুল জনপ্রিয় বাংলার বর্তমান হেরিটেজ সাইট বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের মন্দির শিল্প, যাকে মন্দির নগরী বলা হত সেই বিষ্ণুপুরের মন্দিরের টেরাকোটাগুলি লক্ষ্য করলে বাংলার সেই ধ্রুপদী সংগীতধারাকে দেখতে পাব। আর এখানে সংগীত অর্থে কিন্তু শুধু গীত নয়, গীত বাদ্য নৃত্য তিনের সমন্বয়কে সংগীত বলা হয়েছে। কারণ ত্রয়োদশ শতকে সারঙ্গদেবের ‘সংগীত রত্নাকর’ গ্রন্থে আছে-

‘গীতং বাদ্যং নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতসমুচতে’^১।

তাই গীত বাদ্য নৃত্য একে অপরের পরিপূরক। গৌড়ীয় নৃত্যের সাথে গৌড়ের সংগীতও যে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা প্রমাণ করাই আমার এই রচনার উদ্দেশ্য। এখানে যে যে বিষয় গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি হল- ১) বাংলার এই নৃত্যকে গৌড়ীয় কেন বলা হল? ২) কোন কোন অঞ্চলে এই নৃত্য গীত বাদ্য প্রচলিত ছিল? ৩) তাকে শাস্ত্রীয় আখ্যা কেন দেওয়া হল? কোন কোন শাস্ত্রে, সাহিত্যে, ইহার প্রমাণ পাই? ৪) নৃত্যের সাথে ব্যবহৃত গানকে গৌড়ীয় গীত বা গৌড়ী গীত বা গীতি কেন বলা হয়েছে? ৫) মন্দির ভাস্কর্যে, চিত্রে এই নৃত্য বাদ্যের জীবন্ত মূর্তির নিদর্শন কোথায় আছে?

৬) রাগ রাগিণী, তাল সমৃদ্ধ এই প্রাচীন প্রবন্ধ গান, চর্যাপদ গীত, বৌদ্ধসঙ্গীত, মঙ্গলকাব্য গীত, পুরান সংগীত, বৈষ্ণব পদাবলি সংগীত, লোকসংগীত (বাউল, গম্ভীরা, বিষহরীর গান) গুলি কিভাবে গাওয়া হত এবং এখন তা কোন অবস্থায় আছে?

মহাকাব্য, পুরাণ, চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথিপত্রে, পুন্ড্রবর্ধন, উৎকল, বঙ্গ, গৌড়, তাম্রলিপ্ত, গঙ্গারীড়ি, বরেন্দ্রী প্রভৃতি জায়গার নাম বারে বারে এসেছে। তাই সেই ইতিহাস বিজড়িত সাম্রাজ্যের মধ্যে যে শাস্ত্রীয় আঞ্চলিক নৃত্য, গীত, বাদ্য, সুর, তাল, ছন্দ প্রচলিত ছিল তা দেবতার মন্দিরে, রাজপ্রাসাদের সভাগৃহে, নাট মন্দিরে রামায়ণ, মহাভারত, পুতনাবধ, মনসা মঙ্গল পালা, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার শাস্ত্রীয় পালাগান, নাটক, কীর্তন, রাগরাগিণী, পাঁচালী গান, কথকতা, নৃত্যনাট্য সহযোগে পরিবেশিত হত। খোলা মঞ্চ গ্রাম্য এলাকায় সাধারণ জনসমাজে যেসব সংগীতপালা হত তা কখনো অসুর বধ, কখনো যোগীপাল ভোগীপালের গীত, কখনো জয়দেবের পালাগান, কখনো কৃষ্ণযাত্রা, কেট্টযাত্রা, রাসপালা, চৈতন্যচরিতামৃত, পুতুলনাচের পালা, মনসার ভাসান পালা, চণ্ডীর গান, ষষ্ঠীর পালা, গোপীচন্দ্রের গান, ময়নামতির গান, চন্দ্রাবতির রামায়ণ গীত প্রভৃতি। আবার কখনো সাধারণ মানুষের লৌকিক সুখ দুঃখের গান যেমন - আদি গান, ধূয়া গান, প্রবন্ধ গান, পাঁচালী, কবিগান, তরঙ্গা, কথকথা, কুশান নাচের গান, বিষহরীর গান, ঘুম পাড়ানি গান, শস্য উৎসবের গান, বাউল, পটুয়া সঙ্গীত, পুতুল নাচের গান, ধর্মের গান, টুসু, ভাদু গান, বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালি প্রভৃতি নানা লৌকিক গানও প্রচলিত ছিল।

গৌড়ীয় নৃত্যে বাংলার দেবদাসী ধারা, গৌড়ীয় নৃত্যে বৈষ্ণব দর্শন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গবেষণাতে গীত, বাদ্যের কথা কিছু কিছু এলেও গৌড়ীয় নৃত্যকে সামনে রেখে বাংলার সংগীত ধারাকে নৃত্যের আঙ্গিনায় পর্যালোচনা করা এর আগে খুব একটা হয়নি। আমার এই গবেষণালব্ধ কাজের ফলে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সংস্কৃতিমুখর বাঙালির নৃত্যের তালে তালে ব্যবহৃত সংগীত (গীত, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র) ধারা কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এর ফলে বর্তমান প্রজন্ম গৌড়ীয় নৃত্য তথা বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের পাশাপাশি আঞ্চলিক নৃত্য, গীত, বাদ্য শিক্ষণ সম্পর্কে আগ্রহী হবে। বাংলার প্রাচীন শাস্ত্র, সাহিত্য, পুঁথির মধ্যে যে গুপ্তধন আছে সেই স্বর্ণময় সম্পদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গর্ববোধ করবে। নতুনভাবে আঞ্চলিক নৃত্যগুলি নিয়ে ভাবনা চিন্তার মাধ্যমে তা শাস্ত্রের আঙ্গিনার মধ্যে তুলে ধরার প্রয়াস শুরু হবে। এর ফলে বাংলার বুক থেকে হারিয়ে যাওয়া বা লুপ্ত হতে বসা সংগীত (গীত, বাদ্য ও নৃত্য) ধারাকে শাস্ত্রের আঙ্গিনায় নবরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হতে পারে। যেমন ভাবে ছৌ নাচ, ক্ষত্রীয় নাচ বর্তমানে সরকারি স্বীকৃতি লাভের ফলে সম্মানের জায়গা পেয়েছে, ঠিক সেভাবেই স্বদেশীয় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে কুশান নাচ, নাচনী নাচ, বাউল নাচ, গম্ভীরা, কীর্তন নাচ, প্রভৃতি প্রাচীন গুরু পরম্পরাগত নৃত্য গীত ধারা গুলিকে শাস্ত্রের মণিকোঠায় তুলে ধরে বাংলার পুরাতন সঙ্গীত (গীত, বাদ্য, নৃত্য) ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিস্তার ঘটানো সম্ভব হবে।

ক) ভৌগোলিক সীমানা: বাংলার নৃত্যগীত ধারা যে সব অঞ্চলের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা বারে বারে

পরিবর্তিত হয়েছে। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীত শাস্ত্রগ্রন্থ ‘নাট্যশাস্ত্র’ তে উল্লেখ আছে বাংলার রাগরাগিনী, নৃত্য, গীত, বাদ্যের কথা। তার মানে এই ধারা ‘নাট্যশাস্ত্রের’ও পূর্ববর্তী। ‘ঐতরেয় আরণ্যকে’ বঙ্গ ও মগধের উল্লেখ মেলে। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে পাণিনির ‘অষ্টাধ্যায়ীতে’ ষষ্ঠ অধ্যায়ে ‘অরিস্ত্য গৌড় পূর্বে চ’ সূত্রে গৌড়পুর, বঙ্গ, ও মগধের উল্লেখ পাই। ‘পতঞ্জলি মহাভাষ্যে’ অঙ্গরাজ ও বঙ্গরাজ কথা গুলির উল্লেখ আছে। মহাভাষ্যকার কাত্যায়ন ‘অঙ্গাঃ, বঙ্গাঃ, সুভ্রাঃ, পুভ্রাঃ’ শব্দ গুলির পরিচয় দিয়েছেন। ‘রামায়ণেও’ অঙ্গ বঙ্গের কথা উল্লেখ আছে। পঞ্চম শতকের বৎস্যায়নের ‘কামসূত্রে’ গৌড় দেশের মেয়েদের নাম পাওয়া যায় –

“মৃদু ভাষিন্যনুরাগবত্যো মৃদঙ্গশ্চ গৌড়্যং।”

‘নাট্যশাস্ত্রে’ চার প্রকার নাট্য ও নৃত্যের কথা আছে; যারমধ্যে ‘ওড্রমাগধী’ ধারা থেকে গৌড়ীয় ও ওড়িশির উদ্ভব হয়েছে। গৌড়বঙ্গের ঐতিহাসিক অবস্থান লক্ষ্য করলে ওড্রমাগধীর কথা পাই যা সমগ্র বঙ্গ ও তার পাশাপাশি অঞ্চলকে নির্দেশ করে। ‘নাট্যশাস্ত্র’ গ্রন্থে ওড্রমাগধীর অন্তর্গত অঞ্চলগুলি হল-অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নেপাল, পুণ্ড্র, বৎস, তাম্রলিপ্তক, প্রাগজ্যোতিষ, ভার্গব, মার্গব, পুলিন্দ, ওড্রমাগধ, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, প্লবঙ্গম, মল্লবর্তক, মালদা, ব্রহ্মোত্তর, বিদেহ প্রভৃতি।

“অঙ্গা বঙ্গা উৎকলিঙ্গা বৎসাসৈচবৌড্রমাগধাঃ”।।”

অঙ্গা বা অঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত মুঙ্গের। বঙ্গ বলতে বঙ্গ দেশের মধ্যভাগ। পৌণ্ড্র অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ জেলার রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চল। অন্তর্গিরি ও বহির্গিরি বলতে বিহারের রাজমহল পাহাড় এলাকা ও বীরভূম জেলার অন্তর্গত অঞ্চল সমূহ। প্রবঙ্গ ও মালদা বলতে বোঝায় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও মালদহ অঞ্চল। পুরুলিয়ার ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মল্লবর্তক। মুর্শিদাবাদের পার্শ্ববর্তী এলাকা হল ব্রহ্মোত্তর। সিকিম ও ভুটানের অঞ্চলগুলি ভার্গবা। তমলুক, দক্ষিণ মেদিনীপুর, হুগলীর কিছু এলাকা, ও বাঁকুড়াকে প্রাংগ বলে।

মধ্যযুগে সমগ্র বাঙালিকে ‘গৌড়ীয়া’ শব্দের মাধ্যমে বোঝানো হত। পাঠানরা যখন ভারতবর্ষে আসে তখনো সমগ্র বাংলা গৌড় নামে পরিচিত ছিল। এইসব প্রাচীন সাহিত্য থেকে আমি গৌড়ের সংগীতের ভৌগোলিক ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা করেছি এবং আমার এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছি।

খ) গৌড়ীয় নৃত্য গীতের উৎস ও নামকরণ: আনুমানিক হিসেবে অনেকে সম্রাট শশাঙ্কের রাজত্বকাল থেকে গৌড়বঙ্গ কথাটির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, যা পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দের সময়কালকে ধরা হয়। গৌড়রাজ শশাঙ্ক নিজেকে ‘গৌড়াধিপ’ বলে পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার সুলতানরা নিজেদেরকে ‘গৌড়েশ্বর’ বলতেন। গৌড়ের নাম কখনো গঙ্গোত্রী কখনো বঙ্গ কখনো গৌড়বঙ্গ কখনো বা বাংলা এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিবর্তিত হয়েছে। মিথিলা, গৌড়, কান্যকুব্জ, উৎকল, সারস্বত এই পাঁচ ভাগেও একসময় বিভক্ত ছিল গৌড় সিমানা। পাঁচজন রাজা এই পাঁচটি জায়গার অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু সর্বপ্রধান যিনি তাকে পঞ্চ গৌড়ের অধিকর্তা রূপে ‘পঞ্চ গৌড়েশ্বর’ বলা হত। ‘নাট্যশাস্ত্রে’ গৌড়ী রীতি, গৌড়ী গীতি, গৌড়ী রাগ এর

নাম পাই। বর্তমান মালদহের কাছে গোড়ের সুলতানদের ধ্বংসপ্রাপ্ত গোড় নগরীর পরিচয় পাওয়া যায়। গোড়ী নামে সাহিত্য রচনার রীতি লক্ষ্য করা যায় দন্ডিনের ‘কাব্যদর্শে’, যা ষষ্ঠ শতকের রচনা। মতঙ্গের ‘বৃহদ্দেশী’ গ্রন্থে, বানভট্টের লেখাতে গোড়ী রীতির পরিচয় পাই। ‘বৃহৎসংস্কৃত পুরাণে’ গোড় রাজ (গোড়) কে গান্ধারের কিঙ্কর বলা হয়েছে। এই পুরাণেই কামোদের ভার্য্য স্বরূপ গোড়ীর উল্লেখ আছে। ‘অগ্নিপু্রাণে’ গোড়ীয় রীতি, কাব্যসংগীত, গোড় দেশজাত ভাষা সম্পর্কে আলোচনা আছে। শারঙ্গদেব সংগীত রত্নাকরে কৌশিক জাতি রাগের বিভিন্ন মিশ্ররাগ রূপে গোড়কৌশিক, গোড়কৌশিকমধ্যম প্রকৃতির রাগের পরিচয় দিয়েছেন। আচার্য কাশ্যপমুনি-শুদ্রা, ভিন্না, ভিন্নকা, গোড়ী বা গোড়ীকা ও রাগরীতি, সাধারণী, ভাষা, অন্তর ভাষা, বিভাষা প্রভৃতি গীতির কথা বলেছেন। নারদের ‘সংগীত মকরন্দ’ গ্রন্থে-বঙ্গাল (বঙ্গালী) রাগ, রাগ ও রাগিনীর বর্ণনা আছে। ‘পার্বদেব’ (৭-৯ম শতক) গোড়, তুরস্কগোড় প্রভৃতি দেশী রাগের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বৌদ্ধগ্রন্থ- ‘সমুত্তরনিকায়’ ও ‘খেরগাথাভাষ্যে’ প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ যুগে ৮৮ টি প্রধান জাতির নৃত্য গীত ও বাদ্যের আলোচনা আছে যেখানে গোড় ও বঙ্গ নামক দুটি জাতির সংগীতের কথা আছে। ‘ভাগবত ও বাংলা সাহিত্য’তে গোড় এবং উৎকলে কৃষ্ণভক্তি মূলক গীতের পরিচয় পাই –

‘গোড় – উৎকলাদি দেশে মাধবের গণ।

সবে কৃষ্ণ ভক্তি- প্রেমভক্তি – পরায়ন।’^{৪৮}

‘উজ্জ্বলনীলমণি’ গ্রন্থ এবং ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’, নাটকচন্দ্রিকা এবং রাধাকৃষ্ণগনোদ্দেশদীপিকা, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, নারদপঞ্চমসারসংহিতা, জীব গোস্বামীর ‘গোপালচম্পু’ গ্রন্থ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ষোড়শ শতকের ‘গোবিন্দলীলামৃত’ গ্রন্থ, ওড়িয়া শাস্ত্রের সংগীত গ্রন্থ ‘অভিনয় চন্দ্রিকা’তে ভারতের প্রচলিত সংগীত শৈলী গুলির মধ্যে গোড় শৈলীর উল্লেখ করেছেন। এইসব প্রাচীন গ্রন্থ, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্যে বর্ণিত গোড়বাংলার সাংগীতিক নিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সালে বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ প্রফেসর ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুপারামর্শে বাংলার এই নৃত্য ‘গোড়ীয় নৃত্য’ নামে গৃহীত হয় এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। এই নৃত্য ব্যবহৃত গীত যা ভারতের সময়কাল থেকে গোড়ী গীতি নামে পরিচিত ছিল সেই গোড়ীয় সংগীত সম্পর্কেই আমি এই প্রবন্ধে আলচনা করেছি।

গ) গোড়ের সংগীত ধারা: ধর্মীয় ভাবাদর্শ প্রধান দেবতা কেন্দ্রিক গোড়ীয় নৃত্য বৈদিক কাল থেকে শুরু করে রামায়ন, মহাভারত, হরিবংশপুরান, সংহিতা, জৈনপুরান, বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ পাই। অর্জুন বিরাট রাজার কন্যাকে নৃত্য শিক্ষা দিয়েছিলেন তা আমরা সকলেই জানি। রাজা মহারাজাদের কন্যা থেকে শুরু করে কিন্নর কিন্নরীরাও নৃত্য, গীত, বাদ্য শিক্ষা করত। হরিবংশ পুরানে যদুকুল বংশী রমণীদের নৌকাবিলাস, পীণ্ডুরক তীর্থ গমন, গোপিনীদের রাস নৃত্য ও ছাল্লিসক ক্রীড়া বা হাল্লিসক ক্রীড়ার কথা জানতে পারি। সেখানে নৃত্য গীত প্রধান বিষয়। ‘হরিবংশপুরানে’ রমণী পঞ্চচূড়ার ‘ছালিক্য রাগ’ আবিষ্কারের কথা আছে। নারদ মুনিও তার সামনে গান গাহিতে গিয়ে কিভাবে অপদস্থ হয়েছিলেন তার বর্ণনা পাই। ‘ধর্ম সংহিতার’ একটি শ্লোকে রুদ্রদেব বা মহাদেবকে প্রদক্ষিণরত কপট রূপী মাতৃগনের হাস্যরত বিবিধ প্রকার অঙ্গভঙ্গি মস্তক সঞ্চালন সহ নৃত্য গীত বাদ্যের অপূর্ব বর্ণনা পাই, যা গোড়ীয় নৃত্যের প্রকৃত প্রমাণ স্বরূপ বাঁকুড়ার

বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দির, জোড়বাংলা মন্দির, হংসেশ্বর মন্দিরের ভাস্কর্যে লক্ষ্য করা যায়। বাংলার নর্তেশ্বর শিব-স্বর, তাল ও পদযুক্ত সঙ্গীত অর্থাৎ গান্ধর্ব সঙ্গীত বিদ্যাতে পারদর্শী এবং নৃত্য, গীত, বাদ্যের প্রাণপুরুষ ছিলেন। পাল যুগের ললিত আনন্দ তাণ্ডব ভঙ্গিমায় বহু হাত যুক্ত শিবের মূর্তি বাংলার বহু যায়গায় পাওয়া গিয়েছে। যিনি এক হাতে বীণা, এক হাতে ডমরু, ওপর দুই হাত তালি দেওয়া অবস্থায় নন্দী যাঁড়ের ওপর নৃত্যরত। নদীমাতৃক বাংলার নৃত্য গীতে ললিত আনন্দ তাণ্ডব ভঙ্গিমা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। তাই বাংলার শিবপূজা, গাজন, গম্ভীরা, চড়ক, ধর্মপূজায় বাদ্য সহযোগে ভক্তিভাবপূর্ণ নৃত্য গীত অপরিহার্য অঙ্গ। তাই বাংলার শিবকে ‘নৃত্যপ্রিয়’ বলা হয়। ‘জ্ঞান সংহিতাতে’ নৃত্য গীত সহযোগে পূজা পাঠের বর্ণনা পাই- ‘গীত বাদ্যই স্তুতা নৃত্যই রভক্তি ভাবসমনিতঃ।’

পূজনং প্রথমং যামে কৃত্য মস্ত্রং জপে দুধঃ।। - জ্ঞান সংহিতা

প্রাচীনকাল থেকে বহু সঙ্গীতজ্ঞ বাংলার বিভিন্ন রাজার দরবারে নৃত্য, গীত, বাদ্য পরিবেশন করত ও অনেকে শিখতে আসতো। পাল রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতের চোল রাজারা বাংলার নৃত্য সঙ্গীত ভাস্কর্যের টানে এখানকার নৃত্যশিল্পী সংগীতজ্ঞ, দেবদাসী, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর্যশিল্পী ও পণ্ডিত আচার্যদের এমনকি ললিত আনন্দ তাণ্ডব নৃত্যরত শিব মূর্তিও নিজের রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানকার দিনেও আমরা দেখি কুমোরটুলির দুর্গা, গণেশ, শিব নটরাজের মূর্তি প্রতিমা সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে পূজা অর্চনা করা হয়। কলহনের ‘রাজতরঙ্গিনীতে’ আমরা পুণ্ড্রবর্ধন নগরের কার্তিকের মন্দিরে কমলা নামে এক রমণীর ‘নাট্যশাস্ত্র’ অনুসারী নৃত্যধারা দেখতে পাই, যার নৃত্য দেখে কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে নিজ রাজ্যে নিয়ে যান। কারণ ভারতবর্ষের নৃত্য গীত বাদ্যের নিয়মাবলি সমৃদ্ধ প্রথম শাস্ত্রগ্রন্থ ভারতের ‘নাট্যশাস্ত্র’। এই কমলা সুন্দরীকে নিয়ে বিখ্যাত গান আছে বাংলায় -

‘ভাল কইরা বাজাওরে ঢাকুয়া সুন্দরী কমলা নাচে’।

‘সঙ্গীতরত্নাকরের’ পূর্ববর্তী লেখক নারদের লেখা ‘সঙ্গীত মকরন্দ’ গ্রন্থে আমরা গীত বাদ্য নৃত্যের সমন্বয় সহযোগে ‘সংগীতের’ উৎপত্তির কথা জানতে পারি। ভাব, অভিনয়, তাল, মান, রস সহযোগে নৃত্যের উৎপত্তি পণ্ডিত শুভঙ্করের ‘সঙ্গীত দামোদর’ গ্রন্থেও বলা হয়েছে যথা-গীত থেকে বাদ্যের উৎপত্তি, বাদ্য থেকে উৎপত্তি হয়েছে লয়ের, আর লয় এবং তাল সহযোগে নৃত্য পরিগঠিত হয়েছে। ‘নাট্যশাস্ত্রে’ ভারত ‘মার্গ’ ও ‘দেশী’ নামে সঙ্গীতের দুটি বিভাগ করেছেন। ‘অভিনয় দর্পণ’ গ্রন্থে নন্দীকেশ্বর বলেছেন- মুখগহ্বর থেকে গীতের বাণীর উৎপত্তি। এই গীত হস্তলক্ষন দ্বারা প্রকাশ পায়। তাল রক্ষা হয় পদদ্বয় দ্বারা, নয়ন দ্বারা ভাব প্রকাশ হয়। প্রকৃত গুরু শিষ্য পরম্পরা প্রশিক্ষণ ছাড়া এই সঙ্গীত শিক্ষা সম্ভব নয়। ‘নারদ সঙ্গীতে’ আছে -

‘ন নাদেন বিনা গিতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ

ন নাদেন বিনা গ্রামস্তম্ভাদাত্মকং জগৎ।।’

সারঙ্গদেবের ‘সঙ্গীত রত্নাকরে’ আমরা লাট, কর্ণাট, দ্রাবিড়, অন্ধ্র ও গৌড় এই ৫টি ভারতভূমির কথা লক্ষ্য করি যার প্রত্যেকটিতেই এলা প্রবন্ধ প্রচলিত ছিল। তাই গৌড় তথা বাংলার প্রবন্ধ গৌড়েলা নামে পরিচিত

ছিল। যেখানে গৌড়ী গীত, গৌড়ী রীতি, গৌড়ী রাগ, গৌড়ীয় ধর্ম, গৌড়ীয় পণ্ডিত, গৌড়ীয় শিল্পকলা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্র প্রভৃতি ধ্রুপদী ধারা বয়ে চলেছে। যার বেশিরভাগটাই কীর্তন প্রধান। কীর্তন কথার অর্থ প্রশংসা অর্থাৎ দেবদেবীর প্রশংসাসূচক ধর্মীয় ভাবনাই এই গীতের প্রাধান্য বিষয়।

প্রবন্ধ গীতি: প্রবন্ধ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বন্ধ বা সুন্দর রচনা, যদি কোন রচনাকে বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ করা যায় তাহলে তাকে প্রবন্ধ বলা হবে। তাই শাস্ত্রে বাংলার গৌড়ী প্রবন্ধের পরিচয় পাই। প্রবন্ধের ছয়টি অঙ্গ বিভাগ আছে- স্বর, বিরুদ্ধ, পদ, তেনক, পাট ও তাল। প্রবন্ধ গীতি নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ অর্থাৎ নিবদ্ধ গীতি।

স্বর : ষড়্জ, রিষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ।

বিরুদ্ধ : কবির নাম গুণ স্তুতি বাচক প্রবন্ধ হল বিরুদ্ধ।

পদ : গানের বিষয় বোঝানোর জন্য পদ নামক প্রবন্ধ ব্যবহার হয়।

তেনক : প্রবন্ধ গানে মঙ্গলবাচক শব্দ রূপে তেনক বা তেন শব্দটি ব্যবহার হয়।

পাট : আনন্দ বা চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত বাদ্যের বোলকে প্রকাশ করতে পাট নামক প্রবন্ধটি ব্যবহার হয়।

তাল : নিবদ্ধ প্রবন্ধ গীতিকে তাল বলে।

প্রবন্ধ গানের জাতি পাঁচটি যথা – মেদিনী, আনন্দিনী, দিপনী, ভাবনী ও তারাবলি। আনন্দিনী পাঁচ অঙ্গ যুক্ত, দিপনী চার অঙ্গ, ভাবনী বা পাবনী তিন অঙ্গ ও তারাবলি দুই অঙ্গ যুক্ত প্রবন্ধ। প্রবন্ধের চারটি ধাতু যথা- ধ্রুপ, উদগ্রাহ, মেলাপক, আভোগ। সংগীত পারিজাত গ্রন্থে আছে-

‘প্রবন্ধজাতয়ঃ পঞ্চ বর্তন্তে তাঃ ক্রমেন চ।

ষড়্ভিরঙ্গৈর্মেদিনী ন্যায়ান্দিনী পঞ্চভির্ভবেৎ।।

চতুর্ভি দিপনী প্রোক্তা ত্রিভিঃসৈস্ত পাবনী।

দ্বাভ্যাং তারাবলী জাতিরঙ্গাভ্যামুপজায়তে।।’- সংগীত পারিজাত^৬

প্রবন্ধ গানের এই অঙ্গগুলো গৌড়ীয় সঙ্গীতে বিশেষ করে কীর্তন ও বাউল অঙ্গের গান গুলিতে লক্ষ্য করা যায়। গৌড়ীয় নৃত্যে জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের গান, বাংলার বিভিন্ন লোকসংগীতের সুর, পদ, রাগ, তাল, ও স্বর সহযোগে গীত গান ব্যবহৃত হয়। যেমন -গৌড়ীয় দশাবতার নৃত্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে গান নেওয়া হয়েছে। বাংলার প্রাচীন ওড্রমাগমী বৃত্তির অন্তর্গত মেদিনী জাতীয় প্রবন্ধ অনুসরণ করে বর্তমানে কীর্তনীয়ারা কীর্তন পরিবেশন করে। নীলাচলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের রথযাত্রা উৎসবের সময় স্বয়ং মহাপ্রভু, সাত সম্প্রদায় ও বাংলার সমস্ত ভক্তরা মিলিত হয়ে খোল, চোদ্দ মৃদঙ্গ, ছাপান্ন জোড়া করতাল সহযোগে ‘মহানৃত্য সঙ্কীর্তন’ করেছিলেন। আর এই সাত সম্প্রদায়ের এক এক জন মহাজন মহাপ্রভুর আদেশে রথের সম্মুখে নৃত্যগীত করেছিলেন। যার মধ্যে মহাপ্রভু ‘নাট্যশাস্ত্র’ অনুযায়ী উচ্চগু নৃত্য ও সবশেষে স্বরূপের ধূয়াগান সহযোগে মধুর নৃত্য করেছিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস ও বক্রেশ্বর এরা মহাপ্রভুর চার সম্প্রদায়ের একজন করে নর্তক ছিলেন। চার সম্প্রদায়ের মুখ্য গায়ক ছিলেন স্বরূপ, শ্রীবাস, মুকুন্দ দত্ত ও গোবিন্দ ঘোষ। এছাড়াও প্রত্যেক সম্প্রদায়ে পাঁচ

জন করে পালি গায়ন বা দোহার ও একজন নর্তক ও দুজন মাঙ্গলিক ছিল। বাংলার অন্য সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ছিলেন কুলীন গ্রামের, শান্তিপুরের ও শ্রীখণ্ডের এবং তাদের মুখ্য নর্তকরা হলেন সত্যরাজ, রামানন্দ, অচ্যুতানন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন। কীর্তি ও কীর্তন একই ধাতু হতে উৎপন্ন। কৃষ্ণকীর্তন, কালীকীর্তন এরূপ বিভিন্ন ধারার দেবদেবীর গুণগান বিষয়ক কীর্তন গান রচিত হয়েছে। ৬৪ প্রকার রস সহযোগে কীর্তন করা হয়। ছড়া জাতীয় এক শ্রেণীর লঘু সংগীত যা চৈতন্যদেবের আগে থেকে মধ্য ও পূর্ব বাংলায় প্রচলিত ছিল তা ধুয়াগান। ইহার এক বা একাধিক পদ দোহার সহযোগে গীত হয়। বৈষ্ণবদের ধর্ম প্রণালী সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবান্বিত। সহজিয়া সম্প্রদায়ের মানুষরা কালের প্রভাবে তাদের প্রাচীন ধর্ম ভুলে বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণ আরাধনায় ব্রতী হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণের এবং মহাপ্রভুর লীলা নিয়ে গৌড়ীয় সংগীতেও লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন রচিত হয়েছে। পণ্ডিত শুভঙ্করের লেখা সংগীত দামোদরে আছে –

‘শৃঙ্গার হাস্যকরণ রৌদ্র বীর ভয়ানকাঃ।

বিভৎসাদুত শান্তশ্চ নবনাট্যরসাঃ স্মৃতার।।’^৭

পদকর্তাদের গানের ভাব মাধুর্য কে প্রকাশ করার জন্য এই রস, জাতি, রাগ ও সুর সহ যে অলংকার কীর্তন গায়করা প্রয়োগ করেন তাহা আখর। প্রবন্ধ গীতে রাগ তাল বাদ্য অপরিহার্য অঙ্গ। কীর্তনের চারটি ঘরানা গরানহাটি বা গড়াহাটি, মনোহরসাহী, রানিহাটি, মান্দারিনির মধ্যে ঝাড়খণ্ডী কীর্তন ধারা অবলুপ্ত হলেও ঝাড়খণ্ডের লৌকিক ঝুমুর গায়করা এই কীর্তন পদ্ধতি তাল সুর রাগ অনুসরণ করে গান করে। এভাবে শাস্ত্রীয় থেকে লোকসংগীতের জন্ম হয়।

চর্যা গীত: চর্যা হল আলো আঁধারি ভাষা। লুইপাদ হলেন আদি সিদ্ধাচার্য। আনুমানিক ১২শ শতকে প্রায় ২৪জন পদকর্তার রচিত ৪৭টি গান পাওয়া যায়। পটমঞ্জরী, গবড়া, গুর্জরী, অরু, বল্লভী, পটহ, বঙ্গা, কামোদ, মল্লারী, কাহ্ন গুঞ্জরি, দেশাখ, মালসী, গুবড়া, ধনসী, ভৈরবী, রামক্ৰী, শবরী, গৌড়ী, ভৈরব, প্রভৃতি রাগে গাওয়া হত। বর্তমানে গৌড়ীয় সংগীতে এর কিছু কিছু রাগ গাওয়া হয়। বাঙালি পদকর্তা অদ্বয়বজ্র বাংলায় ‘চতুর বজ্রগীতিকা’ নামে বৌদ্ধ সংকীর্তনমূলক পদ লিখেছিলেন। মৈত্রীপাদের ‘গুরুমৈত্রীগীতিকা’ নামে বাংলা পদাবলী আছে। আনুমানিক অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের সময়কালীন বাংলায় পাল রাজত্ব কালে পাল রাজাদের মহীমা কীর্তন গাথা বা কীর্তিগাথা বা গুণগাথা কীর্তন সমগ্র বাংলায় গাওয়া হত। এছাড়াও বিভিন্ন পদকর্তাদের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর বৃন্দাবন দাসের লেখাতে চর্যাপদের কথা, যোগীপাল, ভোগীপাল, মহিপাল ও ধর্মপালের গীতের কথা জানা যায়। অতীশ দীপঙ্কর নামে এক বাঙালি চর্যাপদ রচয়িতা চর্যার পদ গীত সহযোগে নাচ করতেন। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্য সহযোগে চর্যাপদগুলি গাওয়া ‘নাথসাহিত্যে’ পাই –

‘নাচন্তি যে গোরক্ষনাথ মাদলে করি ভর

মাটিতে না পড়ে পদ আবগ উপর’।।’

চর্যাগানগুলি মৃদঙ্গ, মাদল, বীণা (হেরুক বীণা, কর্করী বীণা, তুম্বক বীণা), বাঁশী, ঘন বাদ্য সহযোগে গীত

হত। প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন এই চর্যার পদগুলি। চার থেকে ছয়টি পদ নিয়ে চর্যার পদগুলি রচিত। বাংলায় ত্রিনাথের গান বা ত্রিনাথের পাঁচালী যা আখ্যান মূলক গীত শোনা যায়। চর্যাপদে আমরা দেহতত্ত্ব মূলক ধারণা পাই। ‘বৌদ্ধ গান ও দোঁহা’ নামক গ্রন্থে যে দেশীয় ও শাস্ত্রীয় রাগ রাগিণী সম্বন্ধিত গান আছে তার মধ্যে গৌড়ীয় বা দেশাখ্য নামে দেশীয় রাগ রাগিণীর মধ্যে বঙ্গাল একটি স্বতন্ত্র ধারা। বৌদ্ধরা দেহকেই সর্বস্বমনে করত। তেমনি বাংলার বাউল, আউল, ফকির, দরবেশ, নেড়া নেড়ি, গোঁসাইরা এই দেহতত্ত্বের গান যুগ যুগ ধরে গেয়ে আসছে। তারা দেহস্বরূপ মানুষে বিশ্বাসী ও সত্যসন্ধানী। এদের প্রত্যেকটি গানে এক গুপ্ত গুপ্ত অর্থ আছে। লোকসংগীতের ধারার মধ্যেই প্রাচীনের ইতিহাস লুকায়িত আছে। বাউল হল বাংলার এক গুরুমুখী সংগীত ধারা। দেহ স্বরূপ ঈশ্বর নিয়ে বহু প্রাচীনকাল থেকে এই বাউলিয়াদের সাধন ভজন মূলক সঙ্গীত ধারা চলে আসছে। এদের সংগীত অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর মার্গ পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। কালের করালে ইহা লোকগীতির পর্যায়ে পড়লেও পূর্বে যে ইহা শাস্ত্রের আঙ্গিনায় গণ্য হত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইহারা লোক সমাজের চিত্র নিজেদের গানে তুলে ধরেন। নিজেরাই গান বাধেন, নিজেরাই গান করেন, কখনও হাতে থাকে গুবগুবি, একতারা, অন্য হাতে ঘুঙ্গুর বাজিয়ে তাল রাখেন, আর সাথে দু বাহু তুলে ঘুরে ঘুরে নাচ করেন। বিখ্যাত বাউল গায়ক লালন ফকির। আমরা রবীন্দ্রনাথের গানে লালন ফকিরের অনেক সুরের প্রভাব দেখতে পাই। লালনের ‘জাত গেলো জাত গেলো বলে’- এই গানটির সুর বর্তমানে গৌড়ীয় সঙ্গীতে বাবহৃত হচ্ছে। যেমন- গৌড়ীয়ে গণেশ বন্দনা-

‘গণেশায় নম নমহ, আদি ব্রহ্ম নিরুপম,
পরম পুরুষ পরাৎপর হে।
খর্ব স্থূল কলেবর, গজ মুখ লম্বোদর
মহাযোগী পরম সুন্দর হে।’

পৌরাণিক কাব্যসংগীত (বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত নৃত্য গীত): মৌর্য যুগের সমসাময়িক কাল থেকে বাংলায় পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম প্রভাব বিস্তার লাভ করে। আমরা ১৮টি পুরাণ ও ১৮টি উপপুরাণের নাম পাই। মালাধর বসুও সনাতন ভগবত পুরাণ আলচনা করতেন গৌড়ের সভায় পঞ্চদশ শতকে। ৭ম শতকে বাংলায় শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য ও সৌর এই পাঁচ শাখার ধর্মীয় আচার বিচার প্রচলিত ছিল। চতুর্থ শতকে রাজা চন্দ্রবর্মার আমলে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পর্বতের এক গুহালিপি থেকে পাহাড়পুরের মন্দির উৎকীর্ণ ভাস্কর্যে কৃষ্ণ লীলার কাহিনী থেকে গৌড়ে বিষ্ণুপূজার কথা পাই। পাল আমলের বাংলার বহু নর্তেশ্বর মূর্তি চোল রাজাদের মন্দিরে বিগ্রহ রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। গৌড়দেশের অনেক বাঙালি যেমন -শ্রীকৃষ্ণ শিব, উমাপতিশিব, ধ্যানশিব দক্ষিণ ভারতের চোল রাজাদের শিব আচার্য। এক সময় তামিলনাড়ুর চিদাম্বরম মন্দির ও দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য মন্দিরগুলিতে সাম গানের পর গৌড়ীয় সংগীত ও তারপর দ্রাবিড় সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। বাঙালি শিবাচার্য বিশ্বেশ্বর শম্ভু এয়োদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের ককাতীয় রাজবংশের গুরু ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে আট জন বাদক ও দশজন নর্তকী ছিল। এছাড়াও মঠ ও অন্নসত্র ছিল ছয় জন নর্তকী, ১৪ জন গায়িকা ও একজন কাশ্মিরি গায়ক। ‘মনসামঙ্গলে’ পাই -

“পদ্মারে লইয়া কাঁখে
নাচে শিব ঘন পাকে”।।”

বাংলার শক্তি আরাধনার দেবীকে নিয়েও নানান মন্ত্র, স্তোত্রগান, বন্দনামূলক গান, আগমনী, বিজয়ার গান রচিত হয়েছে যুগ যুগ ধরে যা গৌড়ীয় সংগীতের মূল উপাদান। গৌড়ীয়তে হরগৌরী তথা অর্ধ নারীশ্বর নৃত্যগীতও করা হয়। যেমন – নৃত্য – অর্ধ নারীশ্বর, তাল – দোঠুকী, রাগ – মালকোষ, ভবপ্রিতানন্দ ওঝার রচনা, গান-

‘অর্ধ বক্ষ ধরিয়া স, অর্ধে পীণ পয়োধর।
বাঘাস্বর, রক্তাস্বর, ভাব ধরিছে গৌরীবেশ।’

একটি অম্বিকা স্তুতি সহ গৌড়ীয় নৃত্য যার তাল চৌতাল এবং রাগ – দেশ, গান –

‘জয় মা অম্বিকে ত্রিলোক পালিকে,
কিংশুক মালিকে হর মনমোহিনী।’

বাংলার শিব বিষয়ক মালদহের গম্ভীরা গান বিখ্যাত। প্রথমে বন্দনা আকারে গান শুরু হয়, যেভাবে গৌড়ীয়তে বন্দনা করা হয়। বাংলায় প্রাচীন কাল থেকে পুতুল নাচ খুব জনপ্রিয় ছিল, যা ভারতের ‘নাট্যশাস্ত্রে’ উল্লেখ আছে। সুতায় পুতুলে টান দিয়ে সূত্রধররা অভিনয় দেখাত, যা থেকে পরবর্তীতে মানুষ দ্বারা সাজ সজ্জার মাধ্যমে নাটক, যাত্রা অভিনয়ের সৃষ্টি হয়। বাংস্যায়নের ‘কামসূত্রে’ নাটক অভিনয়ের উল্লেখ পাই। গাজন, ধর্মের পুজার সময় ভক্তারা বিভিন্ন দেব দেবীর সঙ সেজে এভাবেই নাটক, অভিনয়, নাচ গান সহ গম্ভীরা উৎসব পালন করে। ঘনরামের ‘ধর্মমঙ্গলে’ ধর্ম পুজার গাজনের সময় সারা সপ্তাহ ধরে গীত বাদ্য নৃত্য নাট্য সহ আদ্যের গম্ভীরার উল্লেখ পাই -

‘গায়েন বাদেন সব গাজনের মূল।

হরিহর দেখুক আসি আদ্যের ধুমূল”।। -পাদল পালা, গৌড়েশ্বরের ধর্ম পূজা, ৫৫।

উলা গ্রামে আউল চাঁদ নামে এক গোঁসাই বা ঠাকুর বা ফকিরের নাম শোনা যায়। কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাস, লক্ষ্মীকান্ত নামে তাঁর ২২জন শিষ্য ছিল। তাদের গুরুদের মহাশয় ও শিষ্যদের বরাতি বলা হত। তারা নিজেরা গম্ভীরার বন্দনা মূলক গান লিখত ও গাজনের সময় শিব মন্দিরের সামনে নৃত্যগীত করত। -‘আমরা আউলের ভক্ত বিষ্ণুবাই গম্ভীরাসুন্দর’”^৪।

গৌড়ীয় নৃত্য শিববন্দনাতে শিবকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথের একটি গান সহ ঝাঁপতালে গৌড়ীয় নৃত্য করা হয়। যেমন – ‘হে নিখিল ভার ধারণ বিশ্ব বিধাতা।’

মঙ্গল কাব্য গান: মঙ্গলকাব্য কথার অর্থ শুভ বা মঙ্গলজনক কাব্যগীত। প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্য গীত ও পালাগান আকারে গাওয়া হয়। মধ্যযুগে লৌকিক, পৌরাণিক ও বৈষ্ণব এই তিন নামের মঙ্গল সুচক কাব্য পাওয়া যায়। যেমন- ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, রসিকমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল, জগৎমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল

আরও অনেক মঙ্গল কাব্য। একজন মূল গায়ন, কয়েকজন দোহার ও বায়েন সহযোগে, বাদ্যের তালে তালে মন্দিরা, চামর, খোল ও তানপুরা সহযোগে নাচ গান অভিনয় করতে থাকে। ষোড়শ শতকের দিকে অনেক মঙ্গল কাব্য রচনা হয় যার মধ্যে চণ্ডী মঙ্গল কাব্য অন্যতম। চৈতন্য ভাগবতেও চণ্ডীর বন্দনা আছে। বৃন্দাবন দাস বাঙ্গালীর মঙ্গল চণ্ডীর পূজা রাত্রি সহজগে গান করার কথা বর্ণনা করেছেন। এই রাত্রি জাগরণ গীত বা পাঁচালীকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ‘জাগরণ গান’ বলা হয়। মঙ্গলকাব্য পালার গায়করা টিমালয় বা মধ্যলয় বা ধীরলয়ে টানা টানা সুরে গান গায় পাঁচালীর ঢঙে। তাই মনসামঙ্গল কাব্যগানগুলিকে মনসার পাঁচালীও বলা হয়। একতাল, দোঠুকি তেওট প্রভৃতি নানা কঠিন তালে রাগ আলাপচারী বন্দনা সহ পালা গায়করা গান ধরে সাথে নৃত্য ও অভিনয় করে, নানা রকম সঙ সাজে চরিত্র অনুযায়ী। মঙ্গল কাব্যের বেশিরভাগ দেবীরা মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য স্বর্গের নর্তকিকে নাচে তালভঙ্গ করে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে মানুষ রূপে পাঠায়। বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে চণ্ডী পূজার সাথে দুজন বিখ্যাত কবির চণ্ডীমঙ্গল কাব্য গীত হত। রাত্ বাংলার কবিকঙ্কনের গীত ও গৌড়ের কবি মানিক দত্তের গীত খুবই জনপ্রিয় ছিল।

‘গাইল মানিক দত্ত নোতুন গীত।।’

অষ্ট দিন অভয়া বারিতে কর স্থিতি।

নাট গীত যন্ত্র সমেত লাভ ব্রিহিতি।।

.....

বায়েন তামুর দিনু সম্প্রদা গোছায়া^৬।। ‘- চণ্ডী মঙ্গল, মানিক দত্ত(মালদহ নিবাসী)

একটি গৌড়ীয় চণ্ডী বন্দনা গীত যা কালিকাপুরাণ থেকে নেওয়া মিশ্র রাগ ও অন্যান্য রাগের সংমিশ্রণে দোঠুকি তাল সহযোগে নৃত্য করা হয়। প্রথমে বন্দনা গেয়ে তারপর গানটি শুরু হয়। গানটি হল-

‘নমস্তে চণ্ডীকে চণ্ডী, চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী,

নমস্তে কালিকে কাল, মহাভয় বিনাশিনী।

প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং জগত পালনকারিণী,

.....জগত সৃষ্টি বিধায়িনী।

.....।’

ঘনরামের ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যে এবং রামাই পণ্ডিতের ‘শূন্যপুরানে’ ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতি, গাজন, সন্ন্যাস সন্ন্যাসিনীদের বাদ্য সহযোগে গীত বাদ্য নৃত্য নাট্যের পরিচয় পাই-

“পুষ্পাঞ্জলি গীত পণ্ডিত রাম এ গান।

নাট গীত করে গতি এ চারি চৌপার রাতি

তামর অঙ্গুরি লইএ করে”।। - টিকা পারণ, রামাই পণ্ডিত^৮

‘পুলকে প্রণাম খাটে, পদ্য বাদ্য গীত নাটে,

যোগ যজ্ঞে জাগিল যামিনী^৯।। ‘- ঘনরাম, ৫ম সর্গ,

মনসামঙ্গল কাব্যে আমরা বেহুলার ঠোট থেকে মৃদঙ্গের বোলের সাথে পায়ে তাল দিয়ে নানা রাগ আলাপচারি সহ গান ও নৃত্যের পরিচয় পাই। ঐ যুগে নৃত্য গীতে পারদর্শী তিনজন বাঙালি বধূরও নাম পাই – বেহুলা, পদ্মাবতী ও বিদ্যুৎপ্রভা। এছাড়াও সেক শুভোদয়া নামে এক বাঙালি গৃহবধূর সংগীতেরও পরিচয় পাই। নদীমাতৃক বাংলার আনাচে কানাচে প্রচুর সাপের উৎপাতের হাত থেকে বাঁচতে সর্প দেবী মনসার গীতের মাধ্যমে মনসার পূজা করা হয় যাকে মনসার গান বা মনসার ভাসান গান বা বিষহরীর গান বা পদ্মার গানও বলা হয়।

রাগ রাগিণী: ওড়মাগধীর অন্তর্গত গৌড়ীয় সংগীত ভারতী ও কৈশিকী বৃত্তি অনুসরণ করে। বাকপ্রধান ভারতীয় নারীদের সাজসজ্জা, বেশভূষায়ুক্ত শৃঙ্গার বা আদি রসাত্মক বহু নৃত্যগীত, কামকলা সুকোমলবৃত্তি কৈশিকীর সৌন্দর্য গৌড়ীয় সংগীতকে নাট্যশাস্ত্র কাল থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এই সংগীতে যে রাগগুলি ব্যবহার হয় সেগুলি হল – মালব, বসন্ত, দেশাগ, গোণ্ডকিরি, দেশবরাটী, বিভাস, কর্ণাট, রামকিরী, গুর্জরী, ভৈরবী, মালবশ্রী, বেলাবেলী, কেদার, বঙ্গাল বরাটী, ভাটীয়ালী, শ্রী, বঙ্গাল, পটমঞ্জরী, সিন্ধোড়া, মেঘগৌড়, মালবগৌড়, মালীগৌড়, গৌড়গিরি, বীভাশযকহু, কোড়া, দেশ প্রভৃতি। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে ধানসী রাগ, পটমঞ্জরি, করুণ ভাটিয়ালি, বেলওয়াড়ি, সুহি বা সুই বা সুহই রাগ, বড়াটী, নটমল্লার, গান্ধার প্রভৃতি রাগের নাম পাই। নাট্যশাস্ত্রের 'ভারতী ও কৈশিকী বৃত্তি অনুযায়ী কীর্তনিনারা মহাজনদের রচিত পদাবলী রাগ তাল সুর নৃত্য অভিনয় সহযোগে বিভিন্ন পালা কীর্তন গান করত। টীকাকার পুজারি গোস্বামীর 'বাল বোধিনি' টীকায় রামকিরী, গুর্জরী, বসন্ত, মালব রাগ ও তালের কথা বলেছেন-

‘গীতন্যাস্য মালবরাগ রূপক তাল ইত্যাহ মালবেতি।

তস্য লক্ষণং যথা।’^৬

জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ রাগ তাল সমৃদ্ধ বৈষ্ণব রসশাস্ত্র। একতাল, অষ্টতাল সহ বিভিন্ন রাগে তিনি পদ রচনা করেছিলেন। ‘গীতগোবিন্দের’ যে গানটি দশাবতার নৃত্য রূপে গীত হয় তা রূপক তালে মালব রাগে জয়দেব রচনা করেছেন। যথা-

‘মালবরাগেন রূপকতালেন চ গীতে -

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃত বানসি বেদং।

বিহিত বহিত্র চরিত্রম খেদম্।।

কেশব, ধৃত মীনশরীর, জয় জগদীশ হরে।।’^৫।। ধ্রুবম্।^৬

‘সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম’ গ্রন্থে পুত্র রাগ, স্ত্রী রাগ এবং রাগের স্বর ও গাহিবার সময়ের উল্লেখ আছে। যথা

১) অথ বঙ্গাল রাগ স্ত্রিয়ঃ

‘মৃগীনী মনরঞ্জিনৌ প্রতাপী হংসিকা বরী।

বঙ্গালো ভৈরবপুত্রস্তন্য ভারজ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।’

বঙ্গাল বা শুদ্ধ বঙ্গাল রাগে বর্তমানে গৌড়ীয়তে শিব আলাপচারী ব্রহ্মতালে গাওয়া হয়। মিশ্র বঙ্গাল রাগে গাওয়া হয় সরস্বতী বন্দনা, যেমন- ‘ভবল কমল পরে রে। ও কে বিহরেয়া মরি, বিমল রজত তনু সুষমা সুন্দরি, হেরিকি রূপ মাধুরি’।

গৌড় সারঙ্গঃ -

‘ঋষভাংশ গ্রহ ন্যাসং গৌড়সারঙ্গ এব চ।

গৌড়া সারঙ্গ - সংযুক্তা পুরীয়া সা সংমিশ্রিতা।

দিবসান্তে সদা জ্ঞেরো গৌড়সারঙ্গ ঈরিতঃ।

রে গ ম প ধ নি সা রে গ ম প ধ নি সা।।’

দিনের শেষ ভাগে গৌড় সারঙ্গ রাগ গাওয়া হয় উপরোক্ত স্বর প্রয়োগ করে। গৌড়করী রাগ গাওয়া হত এই স্বর প্রয়োগ করে - ‘গ ম প ধ নি সা রে সা নি নি ধ প ম গ গ ম প গ গ ম প নি সা ধ রে গ ম নি সা রে গ ম সা’।।’

আচার্য মতঙ্গ যে চার প্রকার গীতের কথা বলেছেন তার মধ্যে গমক যুক্ত রাগ সঙ্গীত ছিল গৌড়ী গীতি। গৌড়ে গ্রামরাগ গৌড়পঞ্চম উদ্ভটনাটে প্রয়োগ হত। বর্তমানে বাংলার বিভিন্ন গানে এমনকি গৌড়ীয় নৃত্যে ব্যবহৃত গানে এই রাগ গুলি ব্যবহার হচ্ছে।

নৃত্য গীতে রাগ তালের প্রয়োগ-

১) নৃত্য - নটরাজ, গান - ‘নৃত্যের তালে তালে, হে নটরাজ’।

২) তাল - মিশ্র, রাগ - মিশ্র, নৃত্য - বন্দনা মঙ্গলাচরণ।

৩) তাল - তেওড়া, রাগ - মালকোশ, নৃত্য - অর্ধনারীশ্বর।

৪) তাল - মিশ্র, রাগ - মিশ্র, নৃত্য - কালিতারা।

৫) তাল- ঝাঁপতাল, রাগ- ইমন, নৃত্য- চণ্ডীবন্দনা, গান - ‘বন্দো নারায়ণী ভৈরবী ভবানী, নগেন্দ্র নন্দিনী চণ্ডী’, (বর্তমানে প্রয়োগ- ছৌ নৃত্য, চতুর্ভুজ প্রহরণ মূষিক বাহন)।

৬) তাল - রূপক, রাগ- ভূপালী, নৃত্য-আলাপচারী,,

৭) রাগ- দুর্গা, নৃত্য - বলরাম অবতার,

৮) রাগ- খাম্বাজ, নৃত্য -লীলাকীর্তন ও পুতনাবধ, গান- ‘ধরিয়া মোহন বেশ পরম সুন্দরী’।

মিশ্র খাম্বাজ রাগে বর্তমানে একটি গান- ‘কাম্বাল বলিয়া করিও না হেলা, আমি পথের ভিখারী নহি গো।’

৯) রাগ- বিলাবল বা মিশ্র বিলাবল, তাল - ঝাঁপতাল, নৃত্য- গণেশ বন্দনা,

১০) রাগ- ভৈরবী, নৃত্য - দশমহাবিদ্যা,

১১) রাগ- গৌড়, নৃত্য -হরিহর আলাপচারী।

মার্গ নৃত্য :- মার্গ অর্থাৎ পথ, প্রাচীন ধারার পথের ওপর নির্ভর করে গৌড়ীয় নৃত্যের পুনঃনির্মাণ ঘটেছে।

সেই মার্গগুলি হল – বন্দনা, মঙ্গলাচরণ, আলাপচারী, মহাজনপদ নৃত্য, লীলাকীর্তন নৃত্য, পালানৃত্য, দশাবতার নৃত্য। নৃত্য শুরুর পদ্ধতি- পৃথিবী, মাটি, দেবদেবী ও দিক বন্দনা সংগীত- মঙ্গল সূচক শুভ তাল স্বর আলাপ সহযোগে নৃত্য গীত- শুদ্ধ নৃত্য সহযোগে আলাপচারী- জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহান মানুষদের লেখা পদ গান সহযোগে মহাজনপদ নৃত্য- তারপর দেব দেবীর প্রশংসাসূচক লীলা কীর্তন (গীত, বাদ্য, নৃত্য)- বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে পালা নৃত্য, গীত- সাত্ত্বিক ভাব যুক্ত দশা বা অন্তঃ ভাব নৃত্য হয়।

প্রতিপাদ্য সঙ্গীত বাস্তব : বাংলায় জয়দেব, বিদ্যাপতি, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামাই পণ্ডিত, বিজয় গুপ্ত, কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ, মুকুন্দ রাম, কবি কঙ্কণ, রূপ রাম চক্রবর্তী, জগজ্জীবন, দ্বিজ রাম দাস, নারায়ণ দেব, বংশী দাস, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণিবাস, মালাধর বসু, কাশীরাম দাস, মাধব আচার্য, বিপ্রদাস, ভারতচন্দ্র, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মালাধর বসু, নরোত্তম দাস ঠাকুর এইসব বৈষ্ণব পদকর্তা দের সংগীতের পরিচয় পাই। মধ্যযুগের মূঘল সংস্কৃতির সাথে মিশ্রণের পাশাপাশি বাংলায় নিজস্ব ধারায় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। ইংরেজ শাসনকালে বাংলার শিল্প সংস্কৃতির চর্চা কিছুটা কম হলেও একেবারে থেমে থাকেনি। এই যুগে বহু মহামানব, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্যশিল্পী, বাদক, চারুশিল্পীর কথা পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, নজরুল, নটী বিনোদিনী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সলিল চৌধুরী, প্রমুখ বহু শিল্প রসিকের নাম পাওয়া যায়।

সাহিত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় গৌড়ীয় বাদ্যযন্ত্র :- বাংলার পোড়া মাটি, ইট, বেলে পাথর, ও মাকড়া পাথরের কারুকার্যখচিত মন্দির, নাটমণ্ডপ, রাজপ্রাসাদের সভাগৃহ, বৌদ্ধবিহারে যে নৃত্য গীত বাদ্য, পালাগান ও কথকতার আসর বসতো আজ তা ভগ্নপ্রায় অবস্থায় দাড়িয়ে। হংসেশ্বরী মন্দির, সিদ্ধেশ্বর মন্দির, আদিনা মসজিদ যা আদ্যনাথের মন্দির, বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দির, জোড়বাংলা মন্দির, এছাড়াও দেউল, রাসমঞ্চ, নাটমন্দির প্রভৃতিতে নৃত্যরত বাদক বাদিকার মূর্তি খোদিত আছে। কেউ বীণা বাজাচ্ছে, কেউ মৃদঙ্গ, কেউ আবীর সরার ওপর নৃত্যরত অবস্থায় বাঁশী বাজাচ্ছে। তারা সবাই অলংকার, বেশভূষায় সজ্জিত। বাংলার শৈব মূর্তিগুলি দেখলে তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যরত শিবের হাতে বাদ্য সহযোগে ছবি পাই। পাল যুগের বার হাতের নন্দী যাঁড়ের ওপর বীণা হাতে নৃত্যপরা শিবের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, যেখানে শিবের দুই হাত মাথার উপর তালি দেওয়া অবস্থায় অপর দুই হাত বীণা ধারণরত। নৃত্ত ও নৃত্যে পারদর্শী শিবের ললিত আনন্দ তাণ্ডব নৃত্যের ভঙ্গিমা যুক্ত নৃত্যপরা মূর্তিটি ঢাকা জেলার ভরেন্দ্রা থেকে পাওয়া গিয়েছে। বাংলার এই মূর্তির পাদদেশে খচিত শিলালেখ থেকে নটরাজের নর্তেশ্বর নামটি পাওয়া যায়, অর্থাৎ যিনি তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যে পারদর্শী। পঞ্চদশ শতকের বিজয় গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে শিবের ডমরু, মৃদঙ্গ, ধুমধুমি, প্রভৃতি বাদ্যের নাম পাই যা আজও গৌড়ীয় নৃত্যের শিববন্দনা সংগীতে ব্যবহার হয়।

ঋকবেদেও ঢাক, মন্দিরা সহ নৃত্যের কথা আছে। চারভাগে বিভক্ত এই বাদ্যের গঠন এবং বাজানোর পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার। ১) আনন্দবাদ্য যা চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত ২) ঘনবাদ্য যা মূলত ধাতু নির্মিত ৩) ততবাদ্য

যা তার নির্মিত ৪) সুষির বাদ্য যা ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়। ১) আনন্দ বাদ্যঃ-ঢাক, ঢোল, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল, দুন্দুভি বা ধামসা, ডমরু। ২) ঘন বাদ্যঃ- কাঁসর, করতাল, মন্দিরা, ঘণ্টা ৩) তত বাদ্যঃ সেতার, সরোদ, বীণা, এসরাজ, বেহালা, দোতারী, গুবগুবি, তানপুরা ৪) সুষির বাদ্যঃ সানাই, শঙ্খ, রামশিঙ্গা, বাঁশি, শিঙ্গা। এছাড়াও গাল বাদ্য, ভাণ্ড বাদ্য, প্রভৃতি।

শ্রী বিজন বিহারী ভট্টাচার্য সঙ্কলিত ও সম্পাদিত ‘মনসামঙ্গলে’ আমরা বেহুলা লখিন্দরের বিয়ের সময় ঢাক, খোল, দণ্ডা ভেরি শাঁখ ঘণ্টা প্রভৃতি হাজার বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করি নিম্নোক্ত শ্লোকে –

‘বেহুলা লখিন্দরে ---সুত্র বান্ধে করে
সঘনে পড়ে জয়ধ্বনি।

বাজে খোল দণ্ডা---ভেরি শঙ্খ ঘণ্টা
হরিষ শুনিয়া বাজনি।।

বেহুলা সুন্দরি---মঙ্গলিল হাড়ি
লখাই ঢাকে সপ্তবার।

হাজার বাজনা---পড়িল ঝঙ্কনা
আনন্দ হইল সবাকারে।।’^{১০}

অপর একটি শ্লোকে দেবসভায় বেহুলার নৃত্য, গীত, সহ নানা বাদ্যের পরিচয় পাই-

‘দেবতা সভায় গিয়া---মৃদঙ্গ মন্দিরা লইয়া
নৃত্য করে বেহুলা নাচনী

.....

ঘন ঘন তাল রাখে---অঞ্চলে বয়ান ঢাকে
হাসি হাসি বদন দেখায়
মুখে গায় মিষ্ট বোল ---খদির কাষ্ঠের খোল
তাথই তাথই ঘন বায়।।

.....

নাহি হায় তাল ভঙ্গ ---মনে বড় বাড়ে রঙ্গ
প্রমত্ত ময়ূরী যেন ফিরে।।
রঙ্গে ভঙ্গে হস্ত নাড়ে ---ত্রিভঙ্গ হইয়া পড়ে
এইরূপে নাচে বিনোদিনী।
নৃত্য গীতে মন মোহে--- যতেক দেবতা কহে
ভাল নাচে বেহুলা নাচনী।।’^{১০}

ক্ষমানন্দের এই শ্লোক বেহুলা নামে নাচনীর অপূর্ব নৃত্য ভঙ্গিমার চলন, মুখের মিষ্ট হাসি, অপূর্ব কণ্ঠ ও বাদ্যে নিপুণতা (মৃদঙ্গ, মন্দিরা, কাংস্য, করতাল, খদির কাষ্ঠের খোল) এবং পায়ে নুপুরের তালে তালে

আসাধারণ নৃত্য পটীয়সীতার পরিচয় দেয়। বিভিন্ন মন্দিরের স্থাপত্যে আজও তা লক্ষ্য করা যায়। এই মনসামঙ্গল পালা মৃদঙ্গ, খোল, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খ, চামর সহযোগে আজও বাংলার বিভিন্ন গ্রামে উৎসব অনুষ্ঠানে সারা রাত্রি ব্যাপি গীত হয়। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরানে দেখা যায় গাল বাদ্য, সিঙ্গা, খমক, ভেরি, দুন্দুভি, জয়ঢাক, দামামা, উলুধুনি, শঙ্খ ধনি ও গীত সহযোগে ধর্মঠাকুরের পূজার কথা আছে। আর তাতে তাল রাখছে ডমরু বাদ্য। যেমন –

‘সিঙ্গা এত গান গীত ডুমুরে ধর এ তাল।
ধম ধি আইআ শিব বাজাইছে গাল।।’
‘বাজে এ ঘন সিঙ্গা, খমক ভেরি লিঙ্গা,
দুন্দুভি জয়ঢাক দামামা৫।’ শূন্য পুরান – রামাই পণ্ডিত,
মানিক গাঙ্গুলির ও ঘন রামের ‘ধর্মমঙ্গল’ গ্রন্থে পাই
‘কত পদ্য বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে
ঢাক ঢোল সিঙ্গা কাড়া একাকার ময়।।’- ঘনরাম, ৫ম সর্গ।
‘ঢাক ঢোল সানি কাশী, শঙ্খ ঘণ্টা বীণা বাঁশী,
কাড়া পোড়া তুরী ভেরী বাজে।।’ - রঞ্জায় শালে ভর, মানিক গাঙ্গুলি। ২৪।^৬

তাল : সংগীতের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল তাল, যা সময়ের একক। তালবিহীন সংগীতের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না। তাল ছাড়া সঙ্গীত অনিবদ্ধ সঙ্গীত। ‘সঙ্গীত রত্নাকরে’ তালের একটি শ্লোক হল– ‘গীতং- বাদ্যং তথা নৃত্যং যত স্থানে প্রতিষ্ঠিতম’^৭। শিব ও পার্বতীর মিলিত তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যই গৌড়ীয় নৃত্য তথা অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যের উপাদান। হরিনায়কের একটি শ্লোক হল–

‘সময়স্য সমত্বে ন ব্যঞ্জকত্বে ন চাধিকম,
তালয় ত্যে য সঙ্গীতং যন্তাল নিগদ্যতে’।^৮

গৌড়ীয়তে বর্ণকাল বা মাত্রা দ্বারা তালকে পরিমাপ করা হয়। ৬৪ বর্ণ কাল পর্যন্ত তাল গৌড়ীয় সঙ্গীতে দেখা যায়। গীত বাদ্য নৃত্যে ব্যবহৃত তালের গতি তিন প্রকার যথা দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত। এই লয় বোঝানোর জন্য হাত বা অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা কখনো সশব্দ কখনো নিঃশব্দ ক্রিয়া ব্যবহার হয়। এই সশব্দ ও নিঃশব্দ ক্রিয়াগুলিকে হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে বলা হয় তাল ও ফাঁক আর বাংলায় বলা হয় তাল ও কাল, বা কোশী বা কুশী বা ফাঁক বা ছুট। এই তালি দেওয়ার রীতি প্রাচীন কালে গুহামানবের কাল থেকে চলে আসছে, তারা তাল রক্ষার জন্য হাতে তালি দিত বা কোন কাঠের দণ্ড দিয়ে মাটিতে বা পাথরে আঘাত করে শব্দ উৎপাদন করত। চৈতন্য মহাপ্রভু নিজেও হাতে তালি দিয়ে গাইতেন ও নৃত্য করতেন যা সম্পূর্ণ বাংলার শাস্ত্রীয় রাগ তালকে অবলম্বন করে। ‘চৈতন্য ভাগবতে’ পাই – ‘দিশা দেখান প্রভু হাতে তালি দিয়া’। গৌড়ীয় সংগীতে ব্যবহৃত তালের অবয়ব স্বরূপ আটটি অঙ্গ। যথা –

লঘু- ৪ বর্ণ কাল, গুরু- ৮, প্লাত - ১২, দ্রুত - ২, অনুদ্রুত -১, লঘুবিরাম - ৫, দ্রুতবিরাম -৩, কাকপদ -

১৬ বর্ণ কাল। গৌড়ীয় সংগীতে তালের আবর্তনের তিনটি বিভাগ যথা – শুদ্ধ, সালগ ও সংকীর্ণ।

শুদ্ধ – একটি তালের সাহায্যে এক আবর্তন।

সালগ- দুটি তালের একত্র সহযোগে এক আবর্তন।

সংকীর্ণ – দুয়ের অধিক তালের সহযোগে যদি এক আবর্তন হয় তাহলে সংকীর্ণ তাল। আবার এই গৌড়ীয় সংগীতে তাল ফেরতা হিসেবে সালগ ও সংকীর্ণ ব্যবহার হয়।

গৌড়ীয় সংগীতের যতি হল পাঁচ প্রকার যা লয় প্রত্যাবর্তনের নিয়ম মেনে চলে। যতিগুলি হল – সমা, স্রোতগতা, গোপুচ্ছা, পিপিলিকা, মৃদঙ্গা। গৌড়ীয় সংগীতে শ্রীখোল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা প্রাচীন হরিতকাকৃতি ও যবাকৃতি মৃদঙ্গ-এর সাথে মিল পাওয়া যায়। এই শ্রীখোল বা মৃদঙ্গ বৈষ্ণব সাধকদের সংগীত তথা ভজন সংকীর্ণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাদ্যযন্ত্র। এই বাদ্যে লওয়া, তেহাই, প্রস্তুতি, পরন, লহর, ছক্কা, মাতন, মাখত, হাত, ঘাঁত, প্যাঁচ, প্রবন্ধ, উত্থান, হাতুটি একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চক্রধার প্রভৃতি বোল বাণী সহযোগে বাজানো হয়। এই বাদ্যে তাল বাজানোর নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এই তালের দুটি অঙ্গ যথা- ছুট ও জোড়া। তালাঘাত বা জোড়া বোঝানো হয় ছুটের হাফ মাত্রা অর্ধমাত্রা ব্যবধানে পর পর দুটি তালাঘাত পড়লে। এই তালি দেওয়ার রীতি দ্বাদশ শতকে গোবর্ধন আচার্যের ‘আর্যাসপ্তশতীতে’ পাই- ‘কৃত হসিত হস্ত তালং’^{১৫} ছুট হল নিঃশব্দ ক্রিয়া অর্থাৎ কোন শব্দ হয় না বা তালি পড়েনা। এই ফাঁক দেখানো হয় একটি তালাঘাতের পর অপর একটি তালাঘাত পড়ার পূর্বমাত্রা পর্যন্ত হাত সঞ্চালনা করে নিঃশব্দ ক্রিয়া দেখানোর মাধ্যমে। এই ফাঁক মাত্রার সমষ্টিকে ছুট বলে। গৌড়ীয় সংগীতে ছুট বা নিঃশব্দ ক্রিয়াগুলি যেভাবে দেখানো হয় তার ওপর ভিত্তি করে কাল, কোশী নাম দেওয়া হয়েছে। যখন হাতে তালি দেওয়ার সময় হাত যে অবস্থায় থাকুকনা কেন তার ঠিক নয় দশ ইঞ্চি উপরে উল্লম্ব ভাবে উঠিয়ে যে ক্রিয়া দেখান হয় তাকে কাল বা ছুটকোশী বলে। কোশীর অপর এক অর্থ বাংলায় কোল বোঝায়। নিঃশব্দ ক্রিয়া বোঝানোর সময় যখন হাতটিকে কোলের কাছে টেনে নেওয়া হয় তখন কোশী বা কোল কোশী বলে। গৌড় বাংলার অনেক তালের নামের শেষে কোশী ব্যবহার হয়, যেমন- দশকোশী। এই হস্ত সঞ্চালন ও কুঞ্চন এর মাধ্যমে বহু তালের সৃষ্টি হয়েছে। নরহরি চক্রবর্তীর লেখা ‘গীত চন্দ্রোদয়’ গ্রন্থে ১০১ টি তালের নাম পাওয়া যায়, যা বাংলার নিজস্ব তাল। বাদ্য সম্পর্কে জ্ঞানদাস বলছেন-

‘দৃমিকি দৃমিকি তাতা থৈয়া থৈয়া মাদল মৃদঙ্গ বাজে’।^{১৬}

জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ গ্রন্থে নির্দিষ্ট ছন্দ যুক্ত রূপক, একতালী, যতি, নিসার, অষ্টতালী প্রভৃতি তালের নাম পাওয়া যায়। এছাড়াও বিভিন্ন তালের সমন্বয়ে গুচ্ছতালের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- আদিতাল গুচ্ছ ৮ টি তাল নিয়ে গঠিত, ব্রহ্মতাল গুচ্ছ ৪, পঞ্চতাল গুচ্ছ ৫টি এবং রুদ্রতাল গুচ্ছ ১১ টি তাল নিয়ে গঠিত। জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ গ্রন্থে অষ্টতালে গাওয়া একটি গীত হল – ‘বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত রুচি কৌমুদী।’ এই গানটি কীর্তন গায়করা প্রাচীনকাল থেকে গেয়ে আসছে ‘বদসি অষ্ট তাল’ নামে আটটি তালের ওপর ভিত্তি করে। অষ্টতাল গুলি হল –

আড় - ১০। - বিভাগ - ৪/২/৪ - ১০ মাত্রা

দোজ - ১১। - ৪/৪/৪ - ১২,

যতি - ০।১। - ২/৪/৪/৪ - ১৪,

শশীশেখর - ১১০।১। - ৪/৪/ ২/৪/৪/৪ - ১২,

গঞ্জন - ১১১। - ৪/৪/৪/৪ - ১৬

রূপক - ০। - ২/৪ - ৬

সোম - ১১০ S - ৪/৪/২/৬ - ১৬

বিষমপঞ্চ- ০।১০। - ২/৪/৪/২/৪ - ১৬

গৌড়ীয় সংগীতে ব্যবহৃত তালগুলির নির্দিষ্ট বোল বাণী আছে। এছাড়াও আছে নির্দিষ্ট তাল লিপি চিহ্ন। হিন্দুস্থানি সংগীতের ন্যায় সোম তালি খালির চিহ্ন আছে।

সম - +

এক মাত্রার চিহ্ন -।

অর্ধ মাত্রার চিহ্ন -২

তালের বিভাগের চিহ্ন -/

আঘাত বোঝাতে- ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা ব্যবহার হয়।

ফাঁক - ০

কালের চিহ্ন - . (ডট)

গৌড়ীয় সংগীতে ব্যবহৃত তাল গুলির নির্দিষ্ট আটটি জাতি থাকলেও মূল প্রধান ৫ টি জাতি ব্যবহৃত হয়। যথা -

একাকী - ১ বর্ণ কাল, পক্ষিণী - ২, ত্রস্য - ৩, চতুরস্র - ৪, খণ্ড - ৫, ঋতু - ৬, মিশ্র - ৭, সঙ্কীর্ণ - ৯ বর্ণ কাল।

একাকী, পক্ষিণী, ঋতু এই ৩ টি জাতি গৌড়ীয়তে থাকলেও হিন্দুস্থানিতে নেই। 'নাট্যশাস্ত্রে' ৫টি জাতির উল্লেখ আছে। গৌড়ীয় সংগীতে ব্যবহৃত তালের নির্দিষ্ট ছন্দ, অলংকার, গমক, গ্রহপ্রাণ, মান, লঘু, গুরু ভেদ রয়েছে। গ্রহপ্রাণ- তালগুলি কখন আরম্ভ হবে বা গীত বাদ্য নৃত্যে তাল কখন শুরু হবে অর্থাৎ তালের আগে না পরে গীত শুরু হবে তা বোঝাতে গ্রহপ্রাণ ব্যবহার হয়। ইহার ৩ টি বিভাগ যথা- সমগ্রহ, অতীত গ্রহ ও অনাগত গ্রহ।

সমগ্রহ - গীত, নৃত্য যদি তাল থেকে শুরু হয় তখন সমগ্রহ।

অতীত গ্রহ - যদি তালের আগে গীত নৃত্য শুরু হয় তাহলে অতীত গ্রহ।

অনাগত - তাল শুরু হওয়ার পর যদি গীত ও নৃত্য শুরু হয় তখন অনাগত গ্রহ। অতীত ও অনাগত উভয়ের মিশ্রণে বিষম গ্রহ।

লওয়া - গৌড়ীয় সংগীতে তালের যে বোল বাণী ব্যবহৃত হয় তাকে হিন্দুস্থানি সংগীতে ঠেকা ও গৌড়ীয়তে লওয়া বলে। কীর্তনে গুরু লওয়া ও লঘু লওয়া ব্যবহৃত হয়।

অলংকার - অন্যান্য সঙ্গীতের মত গৌড়ীয় সংগীতেও তালের বর্ণ কাল বা মাত্রাকে দ্বিগুণ ত্রিগুণ ও চারগুণ আকারে আবর্তিত করে বিভিন্ন ছন্দে বোল বাণী রচিত হয়, যা অলংকার নামে পরিচিত। এই অলংকার সংগীতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। বর্তমানে প্রচলিত কয়েকটি তাল হল -

বড় দশকোষী - ২৮ মাত্রা, ছোট দশকোষী - ১৪, আড় - ২০, দোজ - ২৪, যতি - ২৮, শশীশেখর - ৪৪, মদনদোলা - ৪৪, ইন্দ্রভাস - ৫২, গঞ্জন - ৩২, রূপক - ১২, বীরবিক্রম - ৩৬, বিষমপঞ্চম - ৩২, মহামর্গক - ৪৮, কন্দর্প - ২৮, ছোট লোফা - ৬, বৃহৎ লোফা - ৬, পঞ্চতাল - ৬, আদিতাল - ৪, ধামালি - ৮ ও ১৬, মধ্যম দাসপাহিরা - ১৬, ছোট দাসপাহিরা - ৮, এক তাল - ১৬, বড় তেওট - ২৮ প্রভৃতি।

১) লোফা তাল - ১ টি তাল ও ১ টি ফাঁক। ছন্দ - ৩/৩ অর্থাৎ ৬ মাত্রা বা বর্ণ কাল।

গুরু লওয়া

+		.		o		.
ঝা	গে	দা		দা	ঘি	না

লঘু লওয়া

+		.		o		.
তা	খি	তা		তা	খেটা	তিনি

২) বুঝটি তাল - ২ টি আঘাত ও ২ টি ফাঁক। ছন্দ - ৩/৩/৩/৩ অর্থাৎ ১২ মাত্রা।

গুরু লওয়া

+		.		o		.		২		.		o		.
জা	জা	ঝি		না	ঝি	নি		জা	ঝি	নী		ঝে	না	ঙ

লঘু লওয়া

+		.		o		.		২		.		o		.
তা	আক	খি		না	খি	নি		তা	খি	নি		থেই	গুর	গুর

৩) গণেশ তাল : ‘গণেশতাল সংজাতঃ সঙ্গীতে পরিভাষিতঃ।।’ তালের চিহ্ন - o o || (((((ইতি

গনেশতালঃ। [রাগ কল্পদ্রুম, ৩৬]। এছাড়াও ললিত প্যারী, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, মিশ্রতাল, সিংহতাল, গজলীল তাল, বীজয়, গজবাম্প, ষটতাল প্রভৃতি।

চ) রঙ্গমঞ্চ : মঞ্চ শব্দের অর্থ মাচা। বাঁশ, কাঠ, কলার গাছ দিয়ে পাঁচ ছয় হাত উচু করে বাঁশের মাচা তৈরি করে তার উপর কাঠের পাটাতন তৈরি করা হয়। এই উচ্চ আসনে শিল্পীরা নৃত্যগীত পরিবেশন করত। 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে আমরা রঙ্গমঞ্চের নাম পাই। বর্তমানে যাকে আমরা গ্যালারি বলি। হাজার হাজার মানুষ মঞ্চের নির্দিষ্ট আসনে বসে মঞ্চের আনন্দ উপভোগ করতে পারে। ওড্রুমাগধীর রঙ্গমঞ্চ পরিক্রমা হবে উত্তর দিক থেকে ও প্রবেশ দুয়ার হবে দক্ষিণ দিকে। 'নাট্যশাস্ত্রে' আছে মর্তবাসীর রঙ্গালয় ৩২ হাত চওড়া ও ৬৪ হাত লম্বা হতে হবে। নৃত্যনাট্য, গান সহজে শোনার জন্য রঙ্গমঞ্চ মধ্যম আকারের তৈরি করা দরকার। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে', জাতকে দলগত নাটক অভিনয়ের কথা আছে। যেভাবে চণ্ডীমণ্ডপ, দুর্গামণ্ডপে, শিবালয় মন্দির প্রাঙ্গণে মধ্যযুগে বাংলায় নৃত্যগীত নাটক, যাত্রা অভিনয় হত। এইসব রঙ্গমঞ্চকে 'সমাজ মণ্ডল' ও বলা হত। এছাড়াও যখন আলাদা নাট্যমণ্ডপ নির্মাণ করার কথা আসত তখন আগে ভূমি পরীক্ষা করে বাস্তবশাস্ত্র গণনা করে লাঙ্গল দিয়ে কর্ষণ করে মাটি শোধন করে ভূমি পরিমাপ করা হয়। গৃহস্থাপন দ্বারা ভিত্তিপ্রস্তর হয় ও শেষে স্তম্ভস্থাপন ও আচার্যদের দ্বারা অনুষ্ঠান করা হয়। ঘন রামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে গৌড়ের নাটমঞ্চ, নাটমন্দির, রাসমঞ্চ ও রঙ্গমঞ্চের কথা আছে। যেমন –

‘সাজায়ে কদলী – মঞ্চে,
কাটারি পাতিয়ে সঞ্চে,
ভর দিয়া এল ধর্ম বাটে’।

গম্ভীরা বা চড়কের সময় বা দোলের সময়ে রাসমঞ্চ, নাট্যমঞ্চ তৈরি পদ্ধতি এখনও আমরা দেখতে পাই।

উপসংহার : গৌড়ীয় নৃত্য গীত বাদ্য ভারতেরও পূর্বে বলা চলে বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। শাস্ত্রকারদের রচনা সমাজের ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাস্কর্য তখনি প্রাণ পায় যখন তা স্ফুর্ষিত খোদিত হয়। যুগে যুগে বিদেশি জাতি তুর্কি, বর্গি, মোঘলদের আক্রমণের দ্বারা বাঙালি জাতির ঐতিহ্য বার বার ভুলুগ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি তার কলেবরকে। তাই আজও বাংলার বিভিন্ন জায়গার মন্দিরের দেউল, ভাস্কর্য, চিত্রকলার ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করলে প্রাচীন সেই সভ্যতার ইতিহাস বার বার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে জানান দেয় তার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা। আমার এই প্রবন্ধ সেই বিরাট ইতিহাসের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। গৌড়ের শাস্ত্রকাররা যে ধরনের গৌড়ী গীত, গৌড়ী রীতি, নৃত্য, স্রলিপি, আলাপচারী রাগ, রাগিণী, বাদ্য, তাল, ঠেকা বিভাগ করে গিয়েছেন তা আজও বাংলার বিভিন্ন গুরু শিষ্য পরম্পরার সংগীত ধারার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আমার এই প্রবন্ধের ফলে বাংলার নিজস্ব শাস্ত্রীয় ধারা যে গৌড়ীয় সংগীত তা বাংলার মানুষ জানতে পারবে এবং বিশ্বের দরবারে গর্ব করতে পারবে। বহু স্কলার এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করে নতুন নতুন দিক বাংলা তথা বিশ্বের মানুষের সামনে উন্মোচন ঘটাতে পারবে।

গ্রন্থপঞ্জী:

ব্যাসদেব, কৃ. এবং বসু, ন. ১৯৭৩. সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম, ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীত – শাস্ত্রালোচনা ও সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাতি, মারাঠী, কর্ণাটী, তামিল, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আরব্য, পারস্য, পেগুয়ান, ইংরাজী ও রাজপুতানার নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুবের প্রাচীন গান সংগ্রহ. শ্রী রামকমল সিংহ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ - মন্দির, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ২৪৩।

সেনগুপ্ত, প., বন্দ্যোপাধ্যায়, মা. ও মুখোপাধ্যায়, ম. ২০০৪. গৌড়ীয় নৃত্যঃ নিবন্ধগুচ্ছ. দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সু. ও চক্রবর্তী, ছ. ১৯৫৬. ভারত নাট্যশাস্ত্র, প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গানুবাদ – নবপত্র প্রকাশন, ৮, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯।

চট্টোপাধ্যায়, গী. ১৩৬৯ জন্মাষ্টমী. ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য, কবি ও কবিতা, ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলিকাতা ৬।

দাস, শ. ও পালিত, হ. মাঘ ১৩২০. আদ্যের গম্ভীরা বাঙ্গালার ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়. স্টুডেন্টস লাইব্রেরী, ৬৭, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা।

খগেন্দ্রনাথ, মি. আষাঢ়- ১৩৫২. কীর্তন, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা।

মুখোপাধ্যায়, ম. অক্টোবর ২০১৯. সংগীত দামোদর, অনুবাদ. দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬।

মুখোপাধ্যায়, ম. ২০১৭. গৌড়ীয় নৃত্য প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা. দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬।

ভট্টাচার্য, বি. ১৩১২. শ্রী শ্রী গীতগোবিন্দ, (মহাকবি জয়দেবের মূল গ্রন্থের পদ্যানুবাদ), বিশ্বকোষ প্রেস, ৫, রামধন মিত্র লেন, শ্যামপুর, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য, বি. ১৯৬১. মনসামঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী।

মজুমদার, বি. জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী, ভাগবতরত্ন, শতাব্দী গ্রন্থ ভবন, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা -৭।

লেখক পরিচিতি:

^১পি. এইচ. ডি. গবেষক

নৃত্যবিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

ই-মেইল : somasrikoley7@gmail.com

^২অধ্যাপক, নৃত্যবিভাগ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা